SABITA

3107-376X (Online)

Journal Homepage: www.sabitajournal.com

Book Review / গ্রন্থপাঠ

নির্মল কুমার বসু কলকাতা সমাজ ও সংস্কৃতি
সংকলন ও সম্পাদনা - অভীক কুমার দে

ডঃ সঞ্চিতা সান্যাল

Assistant Professor, Department of Political Science, Asutosh College, Kolkata, West Bengal.
E-Mail - sanchita.sanyal@asutoshcollege.in

	Cover
কলকাতা সমাজ ও সংস্কৃতি লেখক - নির্মল কুমার বসু সংকলন ও সম্পাদনা অভীক কুমার দে প্রকাশক - অক্ষর প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ -২০২২	

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থটিতে "পল্লীগ্রামবাসী মানুষ ও অন্যান্য নগরবাসী মানুষের সঙ্গে কলকাতাবাসীগণের মধ্যকার বিবিধ যাপনগত পার্থক্য" রম্য- রসিকতায় বর্ণনা করা হলেও, তাকেই প্রথম কলিকাতা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যের ওপর লিখিত গ্রন্থ বলে ধরে নিতে হয়। কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষজনের ব্যবহার, রীতিনীতি ও বাকচাতুরী নিয়ে এক অসাধরণ আলোচনা তিনি করেছিলেন তাঁর এই গ্রন্থটিতে। বিশেষত, কলকাতার বাবু শ্রেনির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির কথাও বলা হয়েছিলো নিপুন দক্ষতায়। ভবানীচরণ দেখিয়েছিলেন, ধনের অসাম্য ক্রমেই বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু ও জমিদার শ্রেণির মানুষের মধ্যে পূজার্চনার প্রতি ঝোঁক বাড়ছিলো। বাড়ছিলো উৎসব। কবি উৎসব, দুর্গাপুজো এমনকি গয়না উৎসব ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে মেতে ছিলেন সে সময়ের নববাবু ও বিবিরা। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়দের ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ খয়রাতির তালিকাও ভবানীচরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এরপরেও যা আমাদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতে পারে তা হল, ভবাণীচরণের বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী ও ফারসি ভাষার মিশ্রণ নিয়ে আপত্তি। তিনি এই শব্দ মিশ্রণকে যাবনিক ভাষা বলেছিলেন। এ আলাপের গুরুত্ব আজকেও প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, আজকের কলকাতা ও তার সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে অতীত আলোচনা জরুরি।

এখন প্রশ্ন এই যে, আজ যে কলকাতার নগরচিত্র দেখি, তাকে আমরা বুঝব কীভাবে? এই যে কলকাতা বাবু থেকে চাষা ও কামিনের (অন্তজ্য এবং শ্রমিক) এবং করণিকের(কেরানির), বা বিভিন্ন জাতি উপজাতি ধর্ম ভাষার মানুষের বাসার ঠিকানা হয়ে উঠলো তার হিসেবটুকু আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নাগরিক বিন্যাসকে বুঝতে একটি অনবদ্য প্রবন্ধ সংকলন সম্প্রতি পড়ার সুযোগ হয়। কলকাতা নিয়ে পূর্বে যে সব কাজকে আমরা টেক্সট হিসেবে পড়ি, তা মূলত নকশা জাতীয় লেখা। নির্মল কুমার বসুর একাধিক কলকাতাকেন্দ্রিক প্রবন্ধ পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি এ অবধি ছিল অগ্রন্থিত। অভীক কুমার দে সেই সকল প্রবন্ধের সঙ্কলন করেন। ফলত, তাঁর সম্পাদিত এই পুস্তকটি কলকাতা নগরজীবন পাঠকেন্দ্রিক আলাপে বাড়তি সংযোজন হয়ে রইল।

নির্মল কুমার বসু ছিলেন অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর(১৯৫৯ -১৯৬৪)। ভারতীয় নৃবিজ্ঞনের ইতিহাসে তিনি এক স্মরণীয় নাম। গান্ধিজীর একান্ত সচিব হিসেবে তাঁর নোয়াখালী পর্বের অসাধারণ বিবরণ তিনি লিখে গেছেন। অসংখ্য বই ও প্রবন্ধে তিনি ধরে রেখেছেন ভারতীয় সমাজ মনের ইতিবৃত্ত। " কলকাতা ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি' নামক এই পুস্তকটির বাড়তি পাওনা ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের অনবদ্য ভূমিকা। রয়েছে শমীক বন্দোপাধ্যায়ের এক টুকরো কথন। গৌতম ভদ্র ভূমিকাতেই ,লিখেছেন, নির্মল বসু চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতার নাগরিক সমাজের ভিতরের কাঠামোটিকে বুঝতে। তাঁর ভাবনাকে তিনি বস্তুগত ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাতে অজস্র পরিসংখ্যানের ব্যবহার করেছিলেন। নির্মল বিভিন্ন তথ্য বিচারে দেখিয়েছিলেন, কলকাতা শুধুমাত্র বাংলাভাষী ভদ্রলোক সমাজের ঠিকানা হয়ে কেনো থাকে নি। প্রাদেশিক বিভিন্ন সমাজ গোষ্ঠীর মধ্যে মেলামেশা ও তাদের তৈরি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের কাজকারবার কলকাতার পৌরসমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। তবে যেহেতু প্রথম থেকেই জীবিকা অন্বেষণেই কলকাতাকে বেছে নেওয়া হত, সেহেতু কলকাতার সামাজিক পরিসর ছিল অসম এবং ভীষণভাবে কৌমসমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্জিত। কলকাতার সংস্কৃতিতে গজিয়ে উঠেছিলো চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর এক পরিসর। পুরোনো নীতি নৈতিকতাগুলি তামাদি হয়ে গেছিল কলকাতার মানুষের শিকড়হীনতার কারণেই। নির্মল বলছেন, কলকাতার নাগরিক সমাজের যে বিকাশ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, তা নাগরিক জীবনের এক বিকলাঙ্গ বিকাশ।

১৬৯০ এ কলকাতার নগর হিসেবে, বন্দর হিসেবে জন্ম জব চার্নকের হাতে। সেই সময় থেকে ধরলে কলকাতার ইতিহাস আলোচনাকে মূলত তিনটি থাকে বিভক্ত করা উচিত। চার্নকের বানিজ্যকুঠি নির্মাণের কাল থেকে ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের কাল হল প্রথম থাক, যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল এদেশের নিয়ন্ত্রক। ১৮৫৭ এর পর বণিকের মানদণ্ড

রাজদণ্ড রূপে দেখা দিলে কলকাতার সামাজিক চালচিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এল। ফলত, সেই সময় থেকে প্রাক স্বাধীনতা সময়কাল হল দ্বিতীয় ধাপ। স্বাধীনতাত্তোর কলকাতা ছিল দুর্ভিক্ষ, ভারতভাগ ও দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত। ফলত, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কাহিনি এবং সেসবের অতীত অনুসন্ধান তৃতীয় থাকে রাখা যেতে পারে।নির্মল কুমার বসুর আলোচিত প্রবন্ধ সংকলনটি কলকাতা- আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয় থাকটির মধ্যে পড়বে। ১৯৬২-৬৪ সাল ধরে কলকাতার সমাজ জীবনের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানকার আদি বাসিন্দা, তাদের পরিবারের মানুষ জনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে উঠে আসে সে সময়ের কথা, তদের অতীতের কথা। এমনকি পাড়ার ক্লাব, স্কুল, কলেজ মন্দির, মসজিদ গির্জা প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তগুলির অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধানে উঠে আসে কলকাতার নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। এই নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমবায়িতার উৎস ও বিকাশ।

নির্মল প্রশ্ন তুলেছিলেন, একই শহরে বসবাস করেও কেনো মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না? অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যও সামাজিক কারণে শিথিল হয়েছে। নির্মলের সমীক্ষায় উঠে এসেছিলো ভাষা, খাদ্য অভ্যাস, মানসিকতা, অহংবোধ অনেক সময়েই কলকাতার মানুষকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যেমন কলকাতার কলকারখানাগুলিতে কাজ করতে আসা বিহারি বা উত্তর প্রদেশের বহু মজুরদের সঙ্গে বাঙালি মজুর শ্রেণির সখ্যতা গড়ে উঠতে পারেনি, কারণ বাঙালি জাতি হিসেবে চিরকাল উন্নাসিক। তাছাড়া, রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁকার কারণে বাঙালিদের মধ্যে একধরণের শ্রমবিমুখতা তৈরি হয়। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি রিপোর্ট বলছে, বাঙালি কারিগর হল শিল্পী, মজুর নয়। ফলত, বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার নিজস্ব শিল্পভাবনা তাকে ভারী ও বড় শিল্পের দিক থেকে সর্বদা বিমুখ করে রাখে। ১৯৩৫, ১৯৪৩,১৯৪৫-৪৭ ও তার পরেও গ্রাম থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এমনকি বিভিন্ন প্রদেশগুলি থেকেও দলে দলে মানুষ কলকাতায় এসেছেন কখনো কাজের সন্ধানে, কখনো লাভের আশায়, কখনো শিক্ষার প্রয়োজনে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং লগ্নি মূলধনের হাত বদলের ফলে তৈরি হয়েছে আর্থিক অনিশ্চয়তা। এই অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস অনেক সময়েই সামাজিক শ্রেণিভেদকে চালনা করেছে। বাংলার, বিশেষত কলকাতার রাজনীতি স্বাধীনতার সময় থেকেই উচ্চজাতি ও বিত্ত এবং মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে ছিল।ফলত, স্বাধীনতার পরেই কংগ্রেসের হাত ধরে যে শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেখানে অচিরেই শাসকের স্বর শোনা যেতে শুরু করে। কিন্তু, দিনে দিনে অভাব, সমস্যা, নিরন্ন মানুষের মিছিল বাড়তে থাকলে কংগ্রেসের আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির ওপরে মানুষের অনাস্থা তৈরি হতে থাকে। রাজনীতিসচেতন কলকাতায় সরকারবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হতে শুরু করে। নির্মল বলছেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভবনা থাকলেও তা সম্ভব হয় নি, কারণ, পুরানো সমাজবোধের অনুপ্রবেশের ফলে অর্থনৈতিক শ্রেণি ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি।

এই আলোচনার পরিসর আরো নানাবিধ আলাপে বৃহৎ হতেই পারে। তবে আরেকটি অসাধারণ দিকনির্দেশ নির্মল কুমার বসুর থেকে আমরা পেতে পারি। তিনি বলছেন, সামাজিক পরিসরে কৌমগত বাধ্যবাধ্যকতার জন্য যে ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি, সেই ঐক্য অনেক সময়েই ক্লাব, সর্বজনীন পুজো প্রভৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো। সেই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলিও ক্লাব ও পুজোগুলিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। হার্বার্ট রিসলে দেখিয়েছিলেন, কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ণকেন্দ্রিক ও জাত কেন্দ্রিক ছিল। ফলত কলকাতা জুড়ে অনেকগুলি সেন্টার গড়েও উঠেছিল। বাঙালিদের মধ্যে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব কম থাকায়, কলকাতায় বসবাসকারী অন্য প্রাদেশিক মানুষদের সঙ্গে তাদের তেমন ঐক্য গড়ে না ওঠার কারণ এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত ও ধর্মগত আনুগত্য। নির্মল বলছেন, বাঙালি যত প্রগতিশীল হয়েছে, ততই অন্য প্রদেশের মানুষজনের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েছে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকেও ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করেছিল।

নির্মল কুমার বসু ছিলেন গান্ধীবাদী। তাঁর চিন্তাচেতনায় সে ছাপ ছিল স্পষ্ট। তিনি সমাজের অভ্যন্তরে সামাজিক নৈতিকতার বিবর্তন অথবা ক্ষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফলত মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে যাঁরা পড়তে চান, তাঁদের থেকে এই পাঠ ভিন্ন হতে বাধ্য। তবুও, নৃতত্ত্বের দিক থেকে কলকাতাকে এমন নিবিড় ভাবে ও বৈজ্ঞানিক ভাবে তাঁর আগে আর কেউই বুঝতে চেষ্টা করেননি। এই সঙ্কলনটির গুরুত্ব তাই অপরিসীম।।